পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

পদ্মপাতায় জল কেবল ভিন্নমুখী : স্বদেশ সেনের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা

সম্প্রতি বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পেলেন স্বদেশ সেন। অসুস্থ কবির জামশেদপুরের বাড়ি গিয়ে বাংলা আকাদেমির উৎপল ঝা কবির হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুধু যে গভীর আন্তরিকার পরিচয় দিলেন তাই নয়, আকাদেমি বাংলা ভাষা সাহিত্যকে এক চরম অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচালেন। কেননা, এমনটা না ঘটলে ভবিতব্যের কাছে যে একদিন জবাবদিহি করতে হতো এ নিয়ে কাব্যপ্রেমী মূর্খেও প্রশ্ন করবে না। স্বদেশ সেনের খুব কাছাকাছি গড়ে ওঠে আমার অর্থপূর্ণ কবিতাজীবন। জামশেদপুরে ১৯৮৯-৯০ সালে এক সময় প্রায় ফি-শনিবার, কখনো শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বদেশ সেনের সীসাম রোডের বসার ঘরের খাটে কৌরবের পাঠচক্র বসতো। সেখানে পড়তে থাকি আমার সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত কবিতা। এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই শুনতাম স্বদেশদার স্বকন্ঠের স্বরচিত। দু দশক পেরিয়ে এসে আজ বুঝতে পারি কিভাবে সেদিনগুলোয় সৌভাগ্য আমায় সুস্মৃতি গ'ড়ে দিচ্ছিলো।

যারা বাংলা কবিতায় দশকভাগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তারা ১৯৫০ দশকের কবিতার কথা বলতে গিয়ে স্বদেশ সেনকে ভুলে যান তার একটা বড় কারণ স্বদেশ সেনের প্রথম কবিতার বই 'রাখা হয়েছে কমলালেবু' বেরোয় ১৯৮২ সালে, কৌরব থেকে। কৌরবের ৩৩ নং সংখ্যাই ছিলো সেই বই। চার ফর্মার মনোজ্ঞ একটি কালো মলাটের বই (প্রচ্ছদ ঃ শংকর লাহিড়ি) যা বাংলা কবিতার অনেক শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছিল। উদাসীন পাঠক, আত্মভর সম্পাদকরা টের পাননি। খুব সাধারণ জীবনযাপনের পূর্ণতাবোধই স্বদেশ সেনের কবিতার কাঠামোয়। তাঁর কবিসত্ত্বার আদিভাগে। একটা খুব সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর সামান্য লাফায় তাঁর শব্দেরা। একটি দৃশ্য বা ভাবনার গোপনের সমস্ত গুণাগুণে তাঁর যাতায়াত। প্রত্যেক ভাবনা ও দৃশ্যের মধ্যে, প্রত্যেক কাজের মধ্যে এক সুষ্ঠ যুক্তিসন্ধান। ছোট অনুভূতি থেকে বড় জগতে ছড়িয়ে যাওয়া।
যেমন -

ওড়া পাখি সেও বলছে মা, ও মা কোথায়
কী বিশ্বাসে কে বলছে, কারে
ভালো হবে দিনকে দিন, দিনকে দিন
(মনোবাসিনী দিন)

সমস্ত কবির কবিতায় একটা একটা পর্বে এক একটা অদৃশ্য ছক থাকে। স্বদেশ সেনের কবিতা পড়তে বসলেই যে ছকটা আমি দেখতে পাই তার কথা একটু আগেই বললাম - একটা চেনা আয়তন, একটা দৈনন্দিন পরিমিতি যাকে অনবরত অতিক্রম করা যায়। কবিই করেন । উদাহরণ -

ইচ্ছে করে
অনবরতের ডাক ডাকি
সব নিয়ে ডাকতে উঠি আবারকার ডাক
নিয়ে রাখি সমস্তের ভেতর থেকে সব
বিন্দু , রেখা, কোণ ।
জলের যখন ওপর থেকে নীচ নেই
অনেক অনবরত সময়
খোলা চেয়ারগুলি ভাঁজ হয়
আর বেরিয়ে আসে বেরিয়ে যাওয়া ।

এক লাইন দূরত্বের ওপরে একটা পাখি এসে
কোন অসম্ভব মাপ নিয়ে উড়ে যায় ।

(বড় আসা যাওয়া)

স্বদেশ অনেকগুলো জিনিস করেন, খুব সর্ন্তপণে এবং চূড়ান্তরকম নিখুঁতভাবে। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি - 'এ পৃথিবীতে যার সামনে আমি হাত তুলে দাঁড়াই সে এক সুন্দর যুক্তি .. the best reasoning...the best reasoning and the best judgement ...' সেই শ্রেষ্ঠ যুক্তিসন্ধান তো রয়েছেই, তার সঙ্গে আরো কিছু শৈলী । যেমন দৃশ্য, যুক্তি, শব্দ ও সত্যের প্রতিফলন। যেমন ওঁর বহু-আলোচিত কবিতা 'আপেল ঘুমিয়ে আছে'র এক ছটাক দেখা যাক -

আপেল ঘুমিয়ে আছে ওকে তুমি দাঁত দিয়ে জাগাও
নতুন ছালের নীচে রক্ত চেপে খেলা করে দাঁত
সহজে, আপন মনে, চরাচর শান্ত হয় দেখে খুন হয়ে যায়
আপেল ফুলের দিন শেষ হয়, বেড়ে ওঠে নির্বিকার দাঁত।

বারীন ঘোষাল এই কবিতা নিয়ে এক গুরুত্বর্পূণ আলোচনা করতে গিয়ে মনে করেন এটা 'আত্ম-প্রতিকৃতি' ভাঙার কবিতা। এই ভাবনার খেই ধ'রে আরো একটু এগিয়ে আমার মনে হতে থাকে যখন 'আপেল ফুলের দিন শেষ হয়' কবিতার বা শিল্পের ব্যক্তিগত নান্দনিকতাকে নষ্ট ক'রে, শেষ ক'রে, নির্বিকার দাঁতের মতোই জেগে থাকে কবি সত্ত্বা, বা জেগে থাকে এক সংহারী কালিকতা বা temporaneity। বারীনের মতে পঞ্চাশের অন্য উল্লেখযোগ্য কবিদের তুলনায় স্বদেশ সেনের কবিতার নিজস্বতা তার যুক্তিবিন্যাসে। পাঠকের স্বাভাবিক যুক্তিকে তিনি নষ্ট করেন, তাকে ভেঙে, ঢেলে সাজিয়ে তৈরি হয় এক নতুন যুক্তি, যা সম্পূর্ণ বুঝতে হয় না, বোঝার আগেই পাঠকের মনের সঙ্গে তার সেতু গড়ে ওঠে। পাঠককে নতুনভাবে ভাবাতে পারার সংকল্পে নিবেদিত যে কবি তাঁকে সময় ম'নে রাখে। এখানে আরো একবার জন অ্যাশবেরির একটা উক্তি মনে না রেখে উপায় নেই। ওঁর কবিতা কেন দুরুহ এই প্রশ্নের মুখোমুখি অ্যাশবেরি বলেছিলেন - 'পাঠক যা জানে সেটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দিতে আমার মন ওঠে না। সে যেটা জানে না আমি সেটাই তাকে দিতে চেষ্টা করি। সেটাই সত্যিকারের কম্যুনিকেশন।' যা লাভজনক। কিন্তু হয়তো ততো স্বস্তিদায়ক নয়। এপ্রিল ১৯৮৫তে লেখা 'এই আলো এই আয়না' প্রবন্ধের শেষ পংক্তিতে বারীন ঘোষাল লিখেছিলেন - 'একদিন বাংলার সমস্ত কবিতা প্রেমিকের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠবেই স্বদেশ সেনের কবিতা।' স্বদেশ সেনের কবিতার সাথে সাথে এই পুরাতন ভবিষ্যতবাণীকেও কুর্নিশ করি।

শব্দের, বাক্যের খোল থেকে আরো সুস্বাদু অর্থের মাংশ খুঁচিয়ে বের করে আনাই নতুন বা পরীক্ষাভিত্তিক কবিতার কাজ। একটি কবিতাকে দশরকমভাবে পড়তে পারলে তবেই তার নতুন মনোরম। যিনি সেটা স্বাদু মসৃণতায় যত অনায়াসে করেন তাঁর কবিতার গুণ তত বেশি। পরীক্ষা যে হচ্ছে সেটা অনবধান পাঠককে সবসময় বোঝানোর কি দরকার ? স্বদেশ সেনকে তরুণরা যে নিয়মিত অনুধাবন করেন এটাই তার প্রধান কারণ।

স্বদেশ ওঁর কাব্যভাষাকে বিস্ফারিত করেন। সত্য কি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যার কথা বলতে হয় ; 'বেরিয়ে যাওয়া' বোঝাতে বলতে হয় 'বেরিয়ে আসার' কথা। এই দোটানে ভাষা লম্বা হয়, তার গায়ে গুণ লাগে, যেমনটা ছিলো না তেমনভাবে বাংলা কবিতায় । একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়, যার কয়েকটা এরকম -

আপেল ঘুমিয়ে আছে ওকে তুমি দাঁত দিয়ে জাগাও .....

একটা ঘাসের কায়দায় দাঁড়িয়ে শুনলে দুই কানে
এ জীবন থেকে ওই অন্য জীবন কথা ।.....

বনবিভাগের শীতে কার গাড়ি খালি গাড়ি যায় .....

হালকা প্রকৃতি ও তার ভার দেখা
গাছের নীচে গাছের প্রতিফলিত পাতা ।.....

এক পাখি ওড়ো তুমি আর পাখি ফিরে ওড়ো হাজারের দিকে .....

মরা ঘুঘুর একটা দরজা আছে .....

আলোকচিত্র : শংকর লাহিড়ি

তবে আজ, 'রাখা হয়েছে কমলালেবু' পরবর্তী বা ওঁর দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমে, স্বদেশ সেনের কবিকৃতি বা কাব্যচেতনা নিয়ে কয়েকটা কথা। গুরুত্বপূর্ণ কবির কাছে কবিতাভাবনা জরুরী। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় কোনো কোনো কবি তাঁর কবিতাভাবনা নিয়ে তেমন কিছু লেখেননি। স্বদেশ সেন এঁদেরি দলভুক্ত হবেন। কিন্তু সরাসরি না লিখলেও কবিতাভাবনা ওঁর কাছে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং তার বিশিষ্ট চারিত্রিকতা তিনি কৌরবের বহু ক্যাম্পে ও পরবর্তী সাক্ষাতকারে প্রকাশ করেছেন। এখানে চারটে ধারাভাষ্য ও সাক্ষাতকারের সাহায্যে ওঁর কবিতাভাবনা ও তার বিবর্তনকে কিছুটা ধরার চেষ্টা করি। কমল চক্রবর্তী ধৃত কৌরবের বিভিন্ন ক্যাম্পে বলা স্বদেশদার বহু কথাবার্তা থেকে কিছু -

'আমার ভালো লেগেছে ওই 'চেতনকল্প' কথাটা (৮০-র গোড়ায় কমল চক্রবর্তী 'চেতনকল্প'-এর কথা বলেন) */ ছবির নয়, চেতনার কল্পনা। সেভাবে যদি রিফ্লেক্ট করা যায়। ... বিদেশী কম্পোজিশন গুলো দেখো...কত কত নতুন রকম...আমাকে খুব দেয়...আমি অনেক জায়গায় নিয়েছি ... নিতে চেষ্টা করেছি ... জীবনানন্দ স্টেটসম্যান থেকে নোট করতেন ...'* (শিমলিপাল ক্যাম্প, ১৯৭৮-৮১)

'একজন বলেছিলেন উপমাই কবিত্ব। তো আমি এটাকে খুব ক্রেডেন্স দিচ্ছি না...উপমা থেকে তুমি রিলিজ পাবে না। উপমার প্রকৃতিগত রূপ বদলাবে। ... একটা শব্দের পরে আর একটা অবধারিত শব্দ আসতে চায়- প্রত্যেক ভাষাতেই এটা একরকম সেট হ'য়ে থাকে। ... এর থেকে মুক্তি চাই..' (বেতলা ক্যাম্প, ১৯৭৮-৮১)

'ওয়ান ফাইন মর্নিং ভাবলাম যে নতুন কবিতা লিখবো, আর লিখলাম... না, ওভাবে নয়। ... কিছুই সহজ নয়...একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতেও দুবার ব্যাঙ্কে যেতে হয়... তোমাকে তো লিখতে হবে সেই শ্রেষ্ঠ...ইতিহাসে দেখা গেছে যে পাঠক উঠে আসে... পাউন্ড তো তেরোজন পাঠক চেয়েছিলেন ... হুইট্‌ম্যানের কথাটা জানোতো, ... a great poet needs a great audience ... যাক সে কথা, নতুন কাজ চাই... সব হেজে মজে যাচ্ছে। নতুন কবি না আসা পর্যন্ত আমরা যেন কবিতাকে ধরে রাখতে পারি... আমাকে সময় নেবে কি না এটা কোন ভাবনার ব্যাপার নয়... সময়ের ক'লাইন জায়গা জুড়ে থাকবো - নাঃ, এও কিছু না, ... আবার পাঠকও মিসলিড করে... সেটা হয়তো অজ্ঞানে ...এস্টাব্লিশমেন্ট কিন্তু মিসলিড করে সজ্ঞানে। ...এক সময় তো দুজনকেই ভুলতে হবে।' (চাঁদিপুর ক্যাম্প, ১৯৮০)

১৯৯০ এর পরবর্তী অধ্যায়কে স্বদেশ সেনের কবিতার দ্বিতীয়ার্ধ ধরা যেতে পারে। এই দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় একটা বড় রদবদল লক্ষ্য করি। কবিতাভাবনা ক্রমশ চূর্ণ, তার দৃশ্যনির্ভরতা ক'মে এসেছে, চিত্রকল্প কি রূপক সম্বন্ধে উদাসীন এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের সাথে বিচূর্ণভাবে, আঙ্গিকভাবে যুক্ত হ'য়ে ওঠার এক প্রয়াস। ওঁর তৃতীয় বই 'ছায়ায় আসিও' থেকেই এই লেখভঙ্গি তীব্রতর হ'তে থাকে। এ বিষয়ে একদিন স্বদেশদার সাথে আলাপের সময় স্বদেশদা জানান, 'আমি পংক্তিভিত্তিক একটা রচনার চেষ্টা করেছি।' **পংক্তিভিত্তিক ও অবান্তরবাদী** (digressive)। একুশ শতকে এসে স্বদেশ সেনের কবিতায় **বিযুক্তি বা বি-ভাবনার** কিছু চিহ্ন ধরা পড়ছে যা তাঁর পূর্ববর্তী লেখায় ছিলোনা। নিচের দুটো কবিতা দেখা যাক -

'যদিও সুন্দর বারে বারে
এবং প্রতি ফোঁটাই বৃষ্টি
তা হ'লে মাথাই হচ্ছে মস্তক
নিজেই নিজের বুঝিনা বাবা
যদিও সবকিছুই হচ্ছে সমগ্র
যদিও বালু তোমার ছাড়া জল
পালটি তোমার পায়রা
মলিন তোমার সময় নেই

যদিও সন্ধ্যা
নামিছে মন্দ মন্থরে।'

- যদিও সন্ধ্যা/স্বদেশ সেন

'সমস্ত দৌড় জিৎ দিয়ে বাঁধানো যায় না
তামা ছলকায় আর নৌকো চলে
মাথার মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক হয়
অথচ এক খটকা দিয়ে মন খারাপ করা যায়
কেউ বলতে পারে না কার ছায়া কথা বড় হবে
সবই কিছুটা আলতা পায়ে সিঁদুরের গল্প
হিমের বাঁশপাতায় লেখা '

- যদি তক্কা বাজে/ স্বদেশ সেন

'যদিও সন্ধ্যা' কবিতাংশে লক্ষ্য করি জোড়ায় জোড়ায় ভাবনা - কোনোটাই কারো বিরোধী নয়, তবে বিযুক্ত বা বিসম্পৃক্ত। ছোটো ছোটো সুন্দর ও সত্য, যার প্রতি স্বদেশের আকর্ষণ বিখ্যাত, সেখান থেকে আসে বৃষ্টির ফোঁটার কথা ; বৃষ্টি থেকে মাথা ; মাথা থেকে মেধা - 'নিজেই নিজের বুঝিনা বাবা'। 'সমগ্র'-এর ভাবনা থেকে বালু এলো, বালু থেকে জল ; মলিন থেকে সন্ধ্যা ইত্যাদি। 'যদি তক্কা বাজে' কবিতাংশে চিন্তাপ্রবাহ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও প্রত্যাশিত ; ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত দর্শনের বচনে বাঁধা। তবু তার বি-ভাবনা ধরা পড়ে ভাবনার অসংঘাতে। দৌড়-এর থেকেই হয়তো নৌকো চলার কথা আসে। দ্রুতির সূত্র হয়তো ওখানেই। মাথা ও মন এক জায়গায় বাঁধা - সে জায়গাটাকেই হয়তো সন্দেহ। এরপর অনিশ্চয়তা ছায়ার কায়ার আকারে, হিমের বাঁশপাতার সাথে আলতা পা আর সিঁদুরের গল্প-এর মধ্যে অস্পষ্ট এক মিত, সলজ্জ সম্পর্ক।

বৃহত্তর সত্যের সাথে যোগাযোগ কবির যোগাযোগ বাড়ছে। তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে কবির অনবরত চূর্ণায়িত আত্মদর্শন। বৃহত্তর একটি পৃথিবীর নানাবিধ সত্যান্বেষণের একটা ধারাভাষ্য আসতে থাকে। প্রায় স্বগোতোক্তির মতই একটি ধারাভাষ্য। যেমন স্বদেশ লেখেন -

হাওয়া বাতাস লোকোমোটিভ এইসব
এ-ই নিয়ে রেললাইনের মত দেশ
দেশে এবার যাবো কোথায়
কাঁচা কাঁকরের মতো এই দেশে
গমের দানাগুলোকে ওয়াশিংটন ক'রে দেব।

(দুটো কাঠি বেজে উঠবে)

বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে উঠেও বিষয়কে সম্পূর্ণ তাড়ান না। বরং বিষয়ের ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেন। ওঁর 'বিষয়' কবিতাটা পুরোটাই দেখা যাক -

বিষয়

সাদা-সাপটা কথার জোরই আমার জোর
আমার বিষয় বলতে তোমার বিষয়
মাত্রাহীন অসীম আবার কিসের বিষয়
আমার বিষয় টাট্টুর বাজারে টাট্টু।
তোমার পুঁজি ভাঙা
আর দেনাশোধের কষ্টই এক বিষয়
আমার বিষয় আমার অঙ্গুলি হানি
শুকনো জলের শুকিয়ে আসাই এক বিষয়

আমার বিষয় মৃত্যু।

অনেক কিছু, সব কিছুই বিষয়। বিষয় অনেক। প্রত্যেক ভাবনা, তার ইঙ্গিত, ঈশারা সর্বত্রের দিকে। এইভাবে বিষয় তার একহারা ঘর-গেরস্থালি ছাড়িয়ে বহুর মধ্যে মিশে যেতে পেরেছে। কবির নিজের ভাষাতে - 'পদ্মপাতায় জল কেবল ভিন্নমুখী'।

কবিতার শরীরে ধরে অনেককিছু কারণ তার একটা নিজস্ব অনুসন্ধান থাকে সর্বদা। এই অন্বেষণ ছাড়া কবিতার কোন পৌঁছ নেই, কোন কৃতি নেই। অনেক অন্বেষণের মধ্যে সুন্দরের খোঁজই সবচেয়ে স্বাভাবিক, সহজাত। আরো একটা খোঁজ থাকে কবিতায়, সেটা সত্যের। জনমত এই যে সত্য ও সুন্দর অনেকটা একে অন্যের পরিপূরক। ফলত: একের খোঁজ অন্যের শরীরে মিশে যায়। খুব সামান্য এক কথায় স্বদেশ সেনের কবিতাকে বলতে গেলে সুন্দরের মনেই হাত পড়বে। একটা অনাবিল, স্বাভাবিক ভালোলাগার চিহ্নসূত্র খুঁজে চলেছে তার সারাজীবনের কবিতা । কোথায় সে সুন্দর ! স্বদেশ সেন এখানেই ভিন্নদের থেকে বিভিন্ন। তাঁর সুন্দরের ঠিকানা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণছবির গায়ে লেখা নয়। সেই সুন্দর তার চারপাশের অদৃষ্ট বহু দৈনিকচিত্রের স্বাদ-গন্ধের মধ্যে। বেড়াতে গিয়ে প'ড়ে পাওয়া সুন্দর নয়, চোখের সামনে যে 'নতুনের চেয়েও নতুন', সে। এমন এক কবি যিনি বাংলা কবিতার উঠোনের কোন এক কোণে এখনো তাঁর নিজভাষায় মসী মাখান, বদলান নিজেকে ও বাংলা কবিতাকে। লেখেন -

স্নান করে খেয়ে দেয়ে সুন্দর হ'য়ে লেখো
বাংলাভাবের কবিতা
আদুর অবোধ কোমল নীরব ভঙ্গুর দেদার কবিতা
প্রকৃত পশ্চিমবঙ্গের হাঁড়িতে চাপাও মুক্ত আবেগ
সুচিন্তার সাহিত্যকে ভাষা সাহিত্যে আয় বলো

*(*আদুর অবোধ)

জীবনের, দিনটার, দৃশ্যটার, চিন্তাটার, এসময়ের যা কিছু ভালো, যা কিছু সহজ, সরল, মৌলিক তার প্রতি এক **গভীর আস্তিক্যে** স্বদেশ সেনের কবিতা। এই গভীর আস্তিক্যের একটা প্রকাশ ঘটে দুভাবে - জৈবনিকতা ও নান্দনিকতার মাধ্যমে। জীবনের সহজ, সুন্দর, স্বচ্ছ, সরল, ইতিবাচক ভূমিকার নিচে বার বার দাগ দেন স্বদেশ। আবার **উপমার আত্মবাচক** (reflexive relation; a = a) **ব্যবহারে** তাঁর কাব্যতত্ত্বের মধ্যেও এর প্রকাশ ঘটে। যেমন স্বদেশ লেখেন -

১। দু হাত জায়গা ছেড়ে এক হাতি জায়গা দেখো (সভ্যতা)
২। তুমি গাছ হয়ে গাছের লাইনে (তবুও লিরিক)
৩। না হ'ক নাব্য তবু নদীতো নদীই আবার নদও হতে পারে (ব'ল না জায়গা নেই)
৪। সে তো ঝরবে বলেই ঝর্ণা বলেই ঝরে যায়/ সে তো দাগবে বলেই দামী (ভরা কাগজ)
৫। বিশাল এবং অক্ষি/ বিশালাক্ষী/ বিনীতা দেববর্মণই/ বিনীতা দেববর্মণ (অনেক দিন মানে)
৬। শুকনো জলের শুকিয়ে আসাই এক বিষয় (বিষয়)
৭। আমি যা পারিনি তার পার নেই/ তুমি যা পেরেছো সেই পারাটাকে দেখি সেইরূপ (ঘুম-কাক)
৮। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দরজাও বানালাম দেখো (যাওয়া)

আবার পাশাপাশি 'অবান্তরবাদী' উপমা হয়ে উঠছে নানা জলের এক আপন মৌরলা - 'এখন এক লাইন জলে/ নানা জলের এক আপন মৌরলা/ আমার এক উপমার জন্য লাগে।' প্রথাগত ব্যবহারে উপমার মাধ্যমে একটা জিনিস বা ভাবনা বা ক্রিয়াকে অন্যের সাথে মেলানো হয়। তুলনা দেওয়া হয়। ক্রমাগত এই ব্যবহার বস্তু বা ভাবনার মূলরূপকে একভাবে অস্বচ্ছ ক'রে দেয়। তাকে খন্ডন করে। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো 'পোয়েট্রি' (লি চ্যাঙ দঙ-এর দক্ষিণ কোরীয় ছবি) ছবির একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়। সাধারণ মানুষের জন্য চালানো এক কবিতার স্কুল। সেখানে শিক্ষক প্রথমদিন ক্লাসে এসে একটা আপেল টেবিলে রেখে বলেন - এটা কি জানেন আপনারা ?
উত্তর - আপেল।
ব্যাস ? আপেল ? আপেল কি জানেন আপনারা ? বোঝেন ? তাকে তাকে হাতে নিয়ে, নাক, দাঁতে নিয়ে, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেও কি তাকে সঠিক জানা যায় ?

এসব জানতে জানতে কবিতার বোধ জন্মাতে শুরু করে। এবার আপেল ! একদিন সে পাতার আড়ালে লুকিয়ে চাঁদ হয়ে যেতে পারে, কোনোদিন আকাশে জেগে ওঠা ভোরচিহ্ন। এবং ক্রমে ক্রমে নানা তুলনার পর্দা পড়তে পড়তে আপেলের ত্বক ঢেকে যায় একদিন। ক্লিশে হয়ে গিয়ে আপেল। কেবল চাঁদ, আর সূর্য, পাহাড়ি শিশুর গাল আর যুবতী নারীর ঐশ্বর্য হয়ে উঠতে থাকে।

আর ঠিক তখনি আপেলকে আবার আপেলতায় ফিরিয়ে দেওয়া জরুরী। আর সেটা স্বদেশ সেন করেন। নানাভাবে। অব্যর্থভাবে আবারো ইভ বনফোয়ার (Yves Bonnefoy) সেই কথাটা মনে পড়ে যায় - poetry helps us return an object to its real self। স্বদেশ সেনও তার নিজস্ব পদ্ধতিতে উপমাকে তার প্রকৃত মূলরূপটা ফিরিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা রচনাকালীন স্বদেশ সেন কিছু সাক্ষাতকার দিচ্ছিলেন নানা পত্র-পত্রিকায়। সেরকম তিনটে সাক্ষাতকার থেকে কিছু অংশবিশেষ বেছে নিয়ে কবির পরিবর্তনশীল কাব্যভাবনাকে দেখ যাক। প্রথম সাক্ষাতকারটা নিয়েছিলেন তরুণ কবি অরূপরতন ঘোষ। ২০০৫ সালে। 'নতুন কবিতা' পত্রিকার জন্য। সেই সাক্ষাতকারের একটা অংশ অরূপরতন ওর উপন্যাস 'সূর্যহীন'-এ ব্যবহার করে।

'একটা কথা আমার ভালো লেগেছে (কথাটা আমার। বারীন ঘোষালের সাথে ২০০৪ সালে, সে সময়ের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছিলাম যে আমার মনে হয় কবিতা হলো a conversational commentary of a mindgame*) কবির মনের ভিতরে নানারকমের রং, নানান শব্দ, ছবি, বক্তব্য ...এইসবের একটা খেলা রয়েছে। কবিতা হচ্ছে তার এক একটা ডায়ালগ। ... তার মানে এই নয় যে কথোপকথন। তার মধ্যে যে reasoning থাকবে তা কিন্তু নয়। ...এই যে ধারাবিবরণীটা বিক্ষিপ্তভাবে আসবে এবং কোথা থেকে আসবে কবিও তা জানে না।....'*

২০০৬ সালে কবিসম্মেলন পত্রিকায় বারীন ঘোষালকে দেওয়া আর একটি সাক্ষাতকারে স্বদেশ বলেছিলেন -

'কবিতা রচনা নয় কারণ কবিতায় কাজ করে অন্তহীন বিকল্পবোধ। ক্রমাগত ভাঙতে এবং গড়তে থাকে তার গড়ন। ক্রমহীন এই সৃষ্টিকে রচনা হয়তো বলা যাবেনা, শুদ্ধ গঠন বা নির্মাণও বলা যায় না, কারণ কবিতা সততই সাবজেক্টিভ এবং বাস্তবিক ভূমিতল না থাকলে নির্মাণ বা গঠন সম্ভব নয়। না, প্রতিমাও নয় কেননা প্রতিমা তো স্থির রূপকল্প। কবিতা রূপে ও গুণে অস্থির, চিন্তা ও চেতনায় অস্থির। ...'

এই পরবর্তী পর্যায়ের এক কবিতায় হয়তো কৌতূহলকর এক অস্তিরতাকেই বহন ক'রে স্বদেশ লিখছেন -

কবিতায় এখন কি যেন একটা ঘটবে
কাঁচা ডিমে কি যেন একটা ঘটনা
গোত্র আলাদা আর কুম্ভ রাশি
মাটির নিচে কি যেন ঘটনাগুলো দেখো।

(ঘটনা)

জীবন ও শিল্পের সম্পর্কের খনিতে নেমে ওঁর কপালের আলো আমাদের দেখিয়ে দেয় -

'কবি বা শিল্পীর জীবনে কাজ করে অমেরু ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের খেলা। কোনো কবি বা শিল্পী তাঁর যাপনের মধ্য থেকে কী পেলেন এবং কী পেতে পারেন তা ঠিক করে তাঁর অন্তর্গতবোধ বা আত্যন্তিক চেতনা। তাঁর কেন্দ্রগত উৎসার। এত সবের পরেও তাঁদের যাপন ও প্রকাশমানতা অনেক সময় একে অন্যকে কন্ট্রাডিক্ট করে। কখনও অশৃঙ্খল, কখনো কোষবদ্ধ। জীবন ও শিল্পের বর্ণালি এত বড়ো যে তার সমস্ত ব্যবহার সমানুপাতিক হতে পারে না।...'

'মামলা-গাছ' কবিতার এক জায়গায় আমরা এই পংক্তিগুলো পাই -

ট্রেনের মত বারীনের ভেলভেট পোকা
বস্তুতে পেছল পায়ে চলে গেলো
বুনো চকচকে রক্ত লাইনে
শেষ পর্যন্ত মুখের পাউডার টুকুই থাকলো
জীবনময় করেছো সেই ফুল দেখাও
একটা জীবনময় দেখা

'সৃষ্টিকে যদি আমরা প্রোক্রিয়েশন না ভাবি, যদি মনে করি কোনো বস্তু বা গুণবত্তাকে মূল্যবান করে তোলাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে বলতেই হবে অভিজ্ঞতাই সৃষ্টির মূল। এই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, বাইরে থেকে ঘরে ফেরা, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই সেই বীজতলা যার এককগুলি হয়ে ওঠে এক একটা সৃষ্টি। সব অভিজ্ঞতাই শিল্প হয়ে ওঠে না, তাকে অবিভক্ত সময় দিতে হয়। অভিজ্ঞতা কতটা শিল্প হবে তা স্থির করে কবির চেতনা, অতিচেতনা এবং দক্ষতা। কিছুই রেডিমেড নয়। সব কিছুকেই

নিজের নিজের অভিজ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি করে নিতে হয়। এই সব ভ্রমণসূত্রে (কৌরব ক্যাম্পে) *অমি পেয়েছি হয়তো কয়েকটি অঙ্কুর ও আনন্দ।....'*

মনে পড়ে যায় নিচের লাইনগুলো -

চার বেলাকে বুঝতে যা আছে তা থাক বুঝে গেলাম
থাকতে গিয়ে শিখতে হলো ঝড়ের কাঠ জাপটে ধরতে
ছন্ন পাতায় দূরের মুখে একটা ঘর বানাতে
দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দরজাও বানালাম দেখো
(যাওয়া)

২০০৭ সালে কৌরব পত্রিকার তরফ থেকে আমি স্বদেশ সেনের আরো একটা সাক্ষাতকার নিই। সাক্ষাতাকারটা ছিলো কেবলমাত্র কবির কবিকৃতিকে আরো আরো উদ্‌ঘাটনের প্ররোচনা নিয়ে। সেখানে স্বদেশদা তাঁর কবিতাবিশ্বাসের কিছু ভাঁজ করা সযত্নমোড়ক খুলতে খুলতে বলেছিলেন -

'উপমা কবিতার এক অমোঘ উপাদান যা নানাভাবে ও রূপে কবিতার মধ্যে আগমন করে। কিছু আছে স্থির উপমা যেমন 'চাঁদপানা মুখ' আবার কিছু অস্থির উপমা। যেমন রাম বসুর 'আমি সূর্য্যের মতো আকাশ মাড়িয়ে চলে যাবো'। জীবনানন্দের 'পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো কুয়াশার ফুল' এক ভিন্ন ধরণের উপমা। জীবনানন্দ যখন বলেন উপমাই কবিত্ব তখন সেটা আপ্তবাচনের মতো শোনালেও উনি উপমার অনেক উপযোগের কথা ভেবেই হয়তো বলেছিলেন। কবিতার সংসারে উপমা কাজের লোক নয়, গৃহকত্রী। বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে 'মতো' শব্দ সংযত করতে বলেছিলেন, হয়তো ঠিক কথাই বলেছিলেন কিন্তু উপমার জন্য 'মতো' ব্যবহার আবশ্যিক নয়।....'

'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে কবিতার উদ্ভাস প্রবচনের মধ্যে নেই আছে রহস্যময় অস্পষ্টতায়। অশুদ্ধতো নিশ্চয়ই কেননা ভাষাকে, রেখাকে, স্বাভাবিক সুরের বিকৃতির মধ্যেই থাকে শিল্প দর্শন। ... কবিতার মূল প্রতিজ্ঞাকে সফল করতে নানা রকম ভাষাবন্ধনকে ছেড়ে আসতে হয় শব্দের লুকোনো শক্তি ও স্ফুরণকে বের করে আনতে এবং শব্দের পরম্পরাগত ঐক্যকে ভাঙতে। সেই একইভাবে বিষয়বস্তুর একমুখী বন্ধনকে ছাড়াতে হবে। এ কাজ দেশে বিদেশে কিছুকাল থেকেই হচ্ছে। নতুন কিছু নয়। রহস্য বা আলেয়া সৌন্দর্যই কবিতার জৈবমূল। এ জন্য কিছু ছাড়া আর কিছু কুড়িয়ে নেওয়া।... '

স্বদেশ সেনের কবিতা নিয়ে যত আলোচনা, যত মাতামাতি হবার কথা ছিল তত হয়নি। হয়তো কবি নিজেই তার বড় কারণ। স্বদেশ খুব অল্প বয়স থেকেই বাংলার বাইরে জামশেদপুরে রয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের বরিশালে জন্ম স্বদেশ সেনের। শিশুকালেই জামশেদপুরে (থুড়ি, টাটানগরে) চলে আসেন। পরে, শেষ কৈশোরে আবার ফিরে যান বরিশালে কিছুদিনের জন্য। জামশেদপুরে ফিরে এসে সেখানেই সারাজীবন চাকরি। জামশেদপুর ও তার আশপাশের মুক্ত, রুক্ষ-সবুজ প্রকৃতি থেকেই তাঁর কবিতার অনবরত ভিস্যুয়াল, আনন্দ, আমেজ ও হর্ষ। একদিকে এই পরিবেশ যেমন সারাজীবন তাঁর কবিতার শুশ্রুষা করে গেল অন্যদিকে তেমনি স্বদেশ সেন লুকিয়ে রইলেন দূর-বাংলার বেড়ার ধারে। জামশেদপুরের কাগজগুলোতেই লিখলেন অনিয়মিত। শ্রেষ্ঠ কবিতাবলি 'কৌরব' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে কিছু 'কালিমাটি' পত্রিকায়। কলকাতার কাছাকাছিও গেলেন না কোনদিন। কোনোদিন কবিতা পড়লেন না কলকাতায়। যাঁরা তাঁর কবিতা পড়লেন তাদের অধিকাংশ কোনদিন চোখেও দেখলেন না স্বদেশ সেনকে।

==========

রচনাসূত্র ঃ

১. রাখা হয়েছে কমলালেবু/স্বদেশ সেন, কৌরব (১৯৮২)
২. স্বদেশ সেনের স্বদেশ/ স্বদেশ সেন, কবিতা সমগ্র-১, বারীন ঘোষাল সম্পাদিত, কৌরব (২০০৬)
৩. সূর্যহীন/ অরূপরতন ঘোষ, শীলা লাইব্রেরি (২০০৭)
৪. 'এই আয়না এই আলো', আমার সময়ের কবিতা/বারীন ঘোষাল, কৌরব (২০০৩)
৫. স্বদেশ সেনের সাক্ষাতকার/ বারীন ঘোষাল, কবিসম্মেলন (২০০৬)
৬. স্বদেশ সেনের সাক্ষাতকার/ আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, কৌরব ১০৫ নং সংখ্যা (২০০৭)